ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নীলাচলনাথ

সুমনা সাহা

জগন্নাথ শব্দের অর্থ জগতের নাথ। হিন্দুদের অসংখ্য দেবদেবীর মধ্যে প্রধান হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মার পুজো তেমন নেই। হিন্দুদের কাছে জগতের নাথ বলতে বোঝায় বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—একজন পালনের, অপরজন ধ্বংসের ঈশ্বর। জগন্নাথ এমন এক দেবতা, যাঁকে নিজেদের বলে দাবি বৈষ্ণব, শৈব থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধ, জৈন এমনকী আদিবাসী শবর সম্প্রদায়েরও। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'কলিতে দারুব্রহ্ম', আবার 'জগন্নাথের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলে ভক্তি হয়।' নিজে জগন্নাথের অন্নপ্রসাদ 'আটকে' গ্রহণ করতেন এবং ভক্তদেরও তাতে উৎসাহিত করতেন। বলরাম বসুর বাড়িতে জগন্নাথের সেবা—সেই কারণেই বলরামের অন্ন 'শুদ্ধ' মানতেন। শ্রীচৈতন্য তো জগন্নাথের প্রেমে বিভোর হয়ে নীলাচলেই জীবনের অন্তিম ভাগ কাটিয়ে দিলেন।

জগন্নাথ তুমি কার?

অদ্ভুতদর্শন এই দেবতার মূর্তি। অন্যান্য হিন্দু দেবতার সঙ্গে তাঁর মিল নেই। জগন্নাথ বিগ্রহের হাত-পা-কান নেই, কেবল চাকার মতো গোল দুটি বিশাল নয়ন। অন্যান্য দেববিগ্রহ ধাতু কিংবা মৃত্তিকা অথবা প্রস্তর নির্মিত। এখানেও জগন্নাথ বিগ্রহ সকলের চেয়ে ভিন্ন, তিনি দারুমূর্তি, অর্থাৎ কাঠের তৈরি। ওড়িশার আদিবাসী শবর জাতির মানুষ ছিল বৃক্ষ উপাসক। তারা নিজেদের দেবতাকে বলত 'জগনাত'। যা থেকে উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত জগন্নাথ শব্দের। জগন্নাথদেবের পুরোহিতদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রয়েছেন অব্রাহ্মণ 'দয়িতাপতি'রা। যাঁরা নিজেদের শবররাজ বিশ্ববসুর বংশধর বলে দাবি করেন। এই বিশ্ববসুই প্রথমে জগন্নাথের পুজো করতেন। এসমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকদের একাংশের দাবি, জগন্নাথ আসলে আদিবাসী দেবতা।

আবার শাক্তরা দাবি করেন জগন্নাথ হলেন শিব। তিনি দেবী বিমলার ভৈরব। জগন্নাথ মন্দিরের চত্বরে দক্ষিণপশ্চিম কোণে রয়েছে দেবী বিমলার মন্দির। কথিত আছে এখানে দেবী সতীর নাভি পড়েছিল। সেই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিমলা। এখানে জগন্নাথকে নিবেদন করা প্রসাদই বিমলা দেবীকে নিবেদন করা হয়। তারপরই প্রসাদ হয় 'মহাপ্রসাদ'।

সাহিত্যসেবী, সুলেখিকা

বিমলা মন্দিরে আশ্বিন মাসে পনেরো দিন ধরে দুর্গাপুজো হয়। মহিষাসুরমর্দিনী রূপে পুজো করা হয় দেবীকে। জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিরাও শাক্ত।

আবার জগন্নাথদেবের পুরোহিতরা প্রতি বছর ভাদ্রমাসে তাঁকে বিষ্ণুর বামন অবতারের বেশে পুজো করেন। রথযাত্রার সময়ও তাঁকে বামনরূপে পুজো করা হয়, বলা হয় দধিবামন। জগন্নাথকে নৃসিংহস্তোত্র পাঠ করেও পুজো করা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই পেয়েছিলেন। শ্রীমা সারদা দেবীও জগন্নাথদর্শন করে এমনই আভাস দিয়েছিলেন, ''দেখলুম পুরুষ-সিংহ! রত্নসিংহাসনে বসে আছেন, স্বয়ং মা লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন!''

হিন্দুর প্রধান শাস্ত্র বেদে কিন্তু জগন্নাথের কোনও উল্লেখ নেই। রামায়ণ এবং মহাভারতেও উল্লেখ নেই জগন্নাথের। বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যেও তাঁর নাম নেই। অবশ্য কিছু ওড়িয়া বইয়ে দাবি করা হয়েছে, বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধ নন, তিনি জগন্নাথ। তাই প্রশ্ন জাগে, জগন্নাথ আসলে কে? তিনি কি বিষ্ণু? নাকি মহেশ্বর? জগন্নাথ যে আসলে কী এবং কী নন, তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে, অগণিত কাহিনিও ছড়িয়ে আছে। ভক্তরা তাই কোনও যুক্তিতর্কের মধ্যে না ঢুকে জগন্নাথকে সর্বশক্তির আধার হিসেবেই ভাবতে ভালবাসেন।

ওড়িশা জুড়ে তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ। ওড়িয়া ভাষীদের তিনি 'বড় ঠাকুর'। দিনের নানা সময় তাঁর নানা বেশ, ছাপ্পান্ন রকমের ভোগ হয় তাঁর, বছরভর তাঁকে ঘিরে চলে নানা উৎসব। যুগে যুগে দারুব্রহ্ম জগন্নাথের টানে পুরীতে ছুটে এসেছেন বহু সিদ্ধ, সাধক ও মহাপুরুষ। শঙ্করাচার্য থেকে রামানুজ, নিম্বার্ক, গুরু নানক, সন্ত কবীর, গোস্বামী তুলসীদাসজী, শ্রীচৈতন্যদেব—কে না এসেছেন পুরীতে? একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ আসেননি। তিনি বলতেন, পুরী গেলে তাঁর শরীর থাকবে না। তবে তাঁর মহাসমাধির পর শ্রীশ্রীমা যখন পুরী যান, তিনি আঁচলে লুকিয়ে 'ছায়া-কায়া সমান' জ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি নিয়ে গিয়ে স্বামীকে জগন্নাথ দর্শন করিয়েছিলেন।

সমগ্র ওড়িশা জুড়ে ছড়িয়ে আছে ভক্তদের প্রতি জগন্নাথের অহেতুক কৃপার অগণিত লীলাকথা। ধর্ম, আচার-আচরণ, বেশভূষা, জাত নিয়ে মানুষ বিবাদ করে; ঈশ্বর ও ভক্তের মাঝে খাড়া করে বিভেদের পাঁচিল। কিন্তু এই সমস্ত লীলা বারবার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ্বর ভাবগ্রাহী, তিনি আমাদের বাইরেটা নয়—দেখেন অন্তর। তাইতো দারুব্রহ্ম জগন্নাথ রাজার প্রার্থনা যেমন শোনেন, তেমনই শোনেন দীনহীন পতিত জাতির দাসিয়া বাউরির কথা। তিনি সন্ত তুলসীদাসের মনস্কামনা পূরণ করেন, আবার বিধর্মী সালাবেগের সাধও পূর্ণ করেন। ভক্তি ও বিশ্বাসের তেমনই কয়েকটি প্রসিদ্ধ কাহিনি স্মরণ করব আজ।

জগন্নাথের কাঞ্চী-অভিযান

এ-কাহিনি বহু প্রাচীন। পুরীর রাজা পুরুষোত্তম দেব শিকার করতে বনে গিয়ে কাঞ্চীর রাজকন্যাকে দেখেন। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে কাঞ্চীতে বিবাহ প্রস্তাব পাঠালে কাঞ্চীর রাজা সানন্দে সম্মতি দেন। রথযাত্রা দর্শনের জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে কাঞ্চীরাজ পুরীতে এলেন। তিনি রথের সম্মুখে স্বয়ং রাজা পুরুষোত্তম দেবকে পথ ঝাঁট দিতে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে রাজা একমাত্র জগন্নাথ, তাঁরই আদেশে এবং তাঁর প্রতিনিধি হয়ে রাজা রাজ্য শাসন করেন। তিনি জগন্নাথের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। এই আজ্ঞাবাহিতার স্মারকরূপে রথযাত্রার দিন রাজা দীনহীন সেবকের মতো রথের সম্মুখে পথ ঝাঁট দেন। তিনি পথ পরিষ্কার করার পরেই রথযাত্রা আরম্ভ হয়। মহারাজ পুরুষোত্তম দেব এই প্রথাই পালন করছিলেন। কাঞ্চীরাজ তা বুঝতে পারলেন

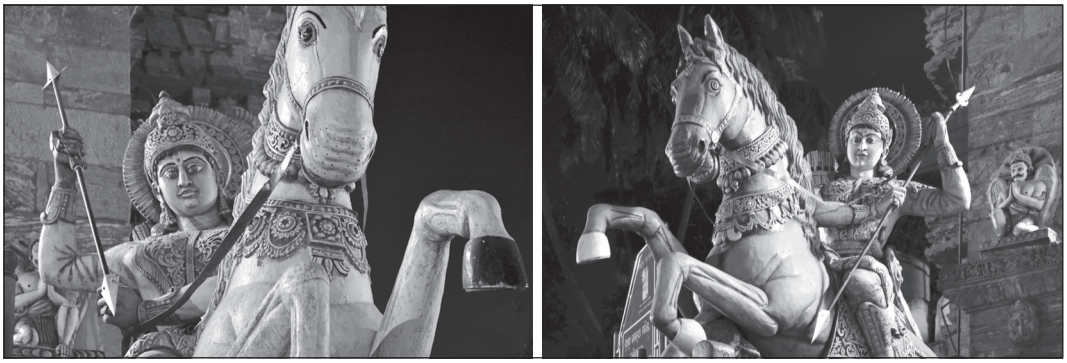

কাঞ্চী অভিযানের স্মারকমূর্তি

না এবং স্থির করলেন, ঝাড়ুদারের সঙ্গে কোনওমতেই মেয়ের বিয়ে দেবেন না। ফলে বিবাহ নাকচ হয়ে গেল। এতে পুরুষোত্তম দেব ক্রুদ্ধ হয়ে কাঞ্চীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর হার হল। তিনি আকুলভাবে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করলেন। কারণ এই হার কেবল তাঁর নিজের পরাজয় নয়—জগন্নাথেরও, কারণ কাঞ্চীরাজ জগন্নাথদেবকেও অসম্মান করেছেন। স্বপ্নে দর্শন দিয়ে জগন্নাথ রাজাকে আবার যুদ্ধ করতে আদেশ দিলেন এবং এবার তিনি তাঁর সহায় হবেন বলে আশ্বস্ত করলেন।

রাজা কাঞ্চী অভিযান করলেন। লোকে বলে, এই যুদ্ধে সেনাদলের পুরোভাগে স্বয়ং জগন্নাথ দাদা বলভদ্রকে নিয়ে যথাক্রমে কালো ও সাদা ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করেছিলেন। কাঞ্চী পরাজিত হল। পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীর রাজকন্যাকে বন্দি করে অনুচরদের আদেশ দিলেন এক ঝাড়ুদার পাত্রের খোঁজ করতে—তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে মনের জ্বালা মেটাবেন। মন্ত্রী কিন্তু বন্দিনী রাজকন্যাকে নিয়ে গেলেন। পরবর্তী রথযাত্রার দিন যখন রাজা রথের সামনে ঝাড়ু দিচ্ছেন, তখন রাজকন্যাকে এনে তাঁর গলায় মালা দেওয়ালেন। হতভম্ব রাজাকে বললেন, ''আপনার আদেশই পালিত হল। আপনার চেয়ে যোগ্য ঝাড়ুদার আর কে আছেন?'' এইভাবে পুরীর রাজার সঙ্গে কাঞ্চীর রাজকন্যার বিয়ে হল।

দাসিয়া বাউরি

পুরী থেকে দুই কিলোমিটার দূরে বালিয়া গ্রাম। অনেককাল আগে সেখানে বাস করত এক তাঁতি। সমাজে নিচু জাতের বা শূদ্র সম্প্রদায়ের বলে 'দাস' বা দাসিয়া তার নামের এক অঙ্গ। দাসিয়া বাউরি বলে তাকে ডাকে লোকে। তার অসামান্য বিষ্ণুভক্তির কথা সবাই জানে। হিন্দুর পরম লক্ষ্য মোক্ষলাভ, তা সে বিষ্ণুভক্তি দ্বারা লাভ করবে, বিষ্ণুনামের ভেলায় চড়ে জন্মমৃত্যু চক্র পার হয়ে যাবে—এই ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস।

একবার রথযাত্রার দিন অনেক মানুষ পুরী যাচ্ছে দেখে সেও তাদের দলে ভিড়ে গেল, মনে সাধ, জগন্নাথ দর্শন করে আসবে। পুরীতে পৌঁছে দাসিয়া রথাসীন জগন্নাথদেবকে দর্শন করে আনন্দে বিভোর হয়ে গেল। আহা কী মহা সমারোহে রথ চলেছে, বলরাম আর সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ চলেছেন যেন রাজরাজেশ্বর! প্রভুর দুটি বিশাল কালো নয়ন দাসিয়ার চিত্ত হরণ করল, মনে মনে সেই মুহূর্তেই সে নিজেকে জগন্নাথের চরণে নিঃশেষে নিবেদন করল। ভাবস্থ হয়ে দাসিয়া পথের ধুলোয় সাষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি দিতে লাগল। আধ্যাত্মিক

আনন্দে পূর্ণ হৃদয়ে ঘরে ফিরে এল সে।

তারা খুবই দরিদ্র। তার স্ত্রী চালের খুদ জ্বাল দিয়ে ফেনাভাত রেঁধেছে, তার সঙ্গে খানিকটা শাক-চচ্চড়ি মণ্ডের মতো গোল করে ভাতের উপর রেখে শ্রান্ত স্বামীকে পরিবেশন করল। সাদা ভাতের উপর সবুজ তরকারির দুটি গোলাকার মণ্ড দেখে দাসিয়ার জগন্নাথের উদ্দীপন হল। সে ভাবচক্ষে দেখল প্রভুর দুটি 'চকা' নয়ন যেন তারই দিকে অনিমেষ চেয়ে আছে। জগন্নাথধামে প্রভু জগন্নাথকে তাঁর ভক্তরা ভালবেসে 'চকাদোলা', 'চকানয়ন' বলে সম্বোধন করে—প্রভুর চাকার মতো গোল দুটি চোখ কীনা!

দাসিয়া বাউরি বলতে থাকল, ''এ আমি কী করে খাই? এ যে প্রভুর চোখ! আমি কী করে খাই?'' দাসিয়ার আর খাওয়া হল না। ভাতের থালা ছেড়ে সে উঠে পড়ল, অস্থির হয়ে ঘরময় ঘুরে সে বলতে থাকল, ''কী করে খাই? এ যে প্রভুর চোখ!''

দাসিয়ার বউ ভয় পেয়ে গেল, সে ভাবল তার স্বামীকে ভূতে পেয়েছে। সে গ্রামের লোকজন ডেকে আনল। তারা এসে সব শুনে ও দাসিয়ার অবস্থা দেখে তার বউকে বলল, ভাতের থালা থেকে শাকের মণ্ড সরিয়ে নিতে। তাই করা হল। তখন দাসিয়া শান্ত হল, ভাত খেল। তার এইরকম উন্মত্ত ভক্তি দেখে গ্রামের লোকের মুখে মুখে তার নাম হয়ে গেল বালিগাঁও দাস।

একদিন জগন্নাথদেব দাসিয়াকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ''দাসিয়া, নিজেকে নিচু জাত ভেবে ছোট মনে কোরো না। তোমার ভক্তি অতুলনীয়। আমার কাছে কী চাও বলো!'' দাসিয়া প্রভুর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে বলল, ''প্রভু, বিশেষ কিছুই আমি চাই না। শুধু এই করো যেন আমার মন সতত তোমার সঙ্গে যুক্ত থাকে। আর আমি যখনই তোমাকে কিছু নিবেদন করব, তুমি স্বহস্তে তা গ্রহণ করবে।'' জগন্নাথ বললেন ''তথাস্তু'', তারপর দাসিয়ার ঘুম ভেঙে গেল।

বালিগাঁও দাসিয়ার কথা ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তবে অনেকে, বিশেষত ব্রাহ্মণরা সেকথা বিশ্বাস করত না। দাসিয়ার মতো এক ছোটলোকের উপর প্রভুর এত কৃপা মেনে নিতে তাদের আপত্তি ছিল। একবার দাসিয়া তার তাঁতে বোনা কাপড় এক ব্রাহ্মণের ঘরে বিক্রি করতে গিয়ে দেখল গাছে ডাব ঝুনো হয়ে নারকেল হয়েছে। দেখেই তার মনে জগন্নাথকে নারকেল নিবেদনের সাধ হল। সে ব্রাহ্মণকে নারকেলের দাম জিজ্ঞেস করতে লোভী ব্রাহ্মণ তখনই বলল, এর দাম ওই কাপড়ের দামের সমান। দাসিয়া বিন্দুমাত্র না ভেবে তাতেই রাজি। কাপড়টি ব্রাহ্মণকে দিয়ে বিনিময়ে নারকেল নিয়ে ফিরে আসছে, পথে দেখতে পেল একজন ব্রাহ্মণ পুরী যাচ্ছে—জগন্নাথকে নিবেদন করার জন্য কাঁঠাল, আম, কলা আর মাখন নিয়ে। দাসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে মিনতি করে বলল, ''আমার এই নারকেলটাও সঙ্গে নিয়ে যান ঠাকুরমশাই। আপনার জিনিস নিবেদন করা হয়ে গেলে শেষে এই নারকেলটা প্রভুকে দিয়ে বলবেন, দাসিয়া পাঠিয়েছে। প্রভু যদি হাত বাড়িয়ে নারকেল নেন, তবেই তাঁর হাতে দেবেন, নইলে ফেরত নিয়ে আসবেন।'' দাসিয়ার কথায় ব্রাহ্মণ মজা পেল। ভাবল, ''পাগলটা কী যে বলছে কোনও ঠিক নেই। যাই হোক, নিয়েই যাই নারকেলটা, তারপর না হয়ে ফেরত নিয়ে আসব।''

পুরীতে পৌঁছে ব্রাহ্মণ জগন্নাথদর্শন করল প্রাণভরে, তারপর সঙ্গে নিয়ে আসা নৈবেদ্য নিবেদন করল। শেষে তার মনে পড়ল দাসিয়ার দেওয়া নারকেলের কথা। মন্দিরের ভিতরে গরুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে সে মনে মনে ভক্তিভরে প্রার্থনা জানাল, ''প্রভু! বালিগাঁও দাস তোমার জন্য এটি পাঠিয়েছে, কৃপা করে গ্রহণ করো।'' তারপর যা ঘটল তাতে ব্রাহ্মণ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার চোখের সামনেই একটি

জ্যোতির্ময় বিরাট হাত বেরিয়ে এসে নিমেষেই নারকেলটা গ্রহণ করল।

এই ঘটনার পর থেকে দূরদূরান্তে দাসিয়ার নাম ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু মন্দিরের সেবায়েতরা তবুও দাসিয়াকে প্রভুর প্রিয় ভক্ত হিসেবে মানতে নারাজ। তারা আগের মতোই নিচু জাত ও অজ্ঞতার জন্য তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত।

প্রভু তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি রঙ্গ করলেন। একবার জগন্নাথকে আম নিবেদন করার ইচ্ছা হওয়ায় দাসিয়া কতগুলি পাকা আম নিয়ে পুরীতে এসেছে। সিংহদ্বারের সামনে পৌঁছতে পাণ্ডারা তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দিল। তারা বলল, ''আমগুলো দাও, আমরাই প্রভুকে নিবেদন করে দেব।''

দাসিয়া কেবল হেসে বলল, ''আমি এই আম প্রভু ছাড়া আর কারও হাতে দেব না। তোমরা দেখবে, প্রভু স্বয়ং আসবেন আর নিজের হাতে আম গ্রহণ করবেন।'' দাসিয়ার গর্বিত বচন শুনে যত সেবায়েতরা জড়ো হয়েছিল, তাকে মন্দিরে যেতে দিয়ে রঙ্গ দেখতে তার পিছন পিছন চলল। দাসিয়া মন্দিরের সামনে পৌঁছে মন্দিরের চূড়ায় নীলচক্রের দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে বলল, ''হে প্রভু, আমি তোমার জন্য কিছু পাকা আম এনেছি, কৃপা করে তোমার দাসিয়ার এই নিবেদন স্বীকার করো!''

দাসিয়াকে ঘিরে যারা ভিড় করেছিল, তারা অবাক হয়ে দেখল যে, কোনও অদৃশ্য হাত দাসিয়ার ঝুড়ি থেকে একের পর এক আম তুলে নিচ্ছে! দেখতে দেখতে চোখের পলকে ঝুড়ি শূন্য হয়ে গেল। লোকজন বলাবলি করতে লাগল, ''আরে! আমগুলো গেল কোথায়?'' দাসিয়া হাসতে হাসতে বলল, ''যাও, মন্দিরে গিয়ে দেখো, প্রভু আম খাচ্ছেন।''

কয়েকজন অবিশ্বাসী সেবায়েত তখনই ছুটল গর্ভমন্দিরে। তারা দেখল, রত্নসিংহাসনের চারপাশে ছড়িয়ে আছে আমের খোসা আর আঁটি। তখন তাদের বিশ্বাস হল, দাসিয়ার ভক্তি এত খাঁটি যে স্বয়ং জগন্নাথ তার ভক্তিতে বাঁধা পড়েছেন! তারা তখনই প্রভুর প্রসাদী মালা নিয়ে ছুটে এল দাসিয়ার কাছে; তাকে মালা পরিয়ে আনন্দে তাকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগল। বলল, ''ওরে দাসিয়া! তুই সত্যিই প্রভুর হৃদয় লুট করেছিস!'' এই ঘটনার পর থেকে জগন্নাথদেবের অনন্য ভক্তদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে দাসিয়ার নাম প্রচারিত হল। লোকের বিশ্বাস, জগন্নাথ দাসিয়া বাউরিকে নিজের সকল অবতার রূপ দর্শন করিয়েছেন।

সন্ত তুলসীদাস

রামচরিতমানস রচয়িতা সন্ত তুলসীদাসজী মোক্ষক্ষেত্র কাশীতে বাস করতেন। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তররামচরিত পাঠ করে তিনি জেনেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গিয়ে কলিযুগের পরব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথকে দর্শন ও পূজা করার আদেশ দিচ্ছেন। এটি পাঠ করার পর তুলসীদাসেরও সাধ হয় পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাওয়ার। সেসময় তাঁর অনেক বয়স হয়েছে, তথাপি তিনি পদব্রজে কাশী থেকে জগন্নাথধামের উদ্দেশে রওনা দিলেন। পুরীতে পৌঁছেই তিনি ছুটে গেলেন শ্রীমন্দিরে এবং বাইশ পাহাছা (বাইশ সিঁড়ি) অতিক্রম করে গর্ভমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করলেন। কিন্তু বিগ্রহ দেখে তিনি হতাশ হলেন। এ কেমন রূপ পরমব্রহ্মের? হাত নেই, পা নেই, কান নেই, দুটি বিশাল গোল চক্ষু, রত্নসিংহাসনে বসে পূজা গ্রহণ করছেন। প্রভু রামচন্দ্রের মতো তীর-ধনুক হাতে জগন্নাথকে দেখবেন—এই সাধ বুকে নিয়ে তিনি অতদূর থেকে অত কষ্ট করে এসেছেন। ঈপ্সিত রূপে ইষ্টদেবতার দর্শন না পেয়ে মর্মাহত তুলসীদাস ফিরে চললেন কাশীতে। তিনি প্রসাদ গ্রহণ করলেন না। এমনকী অভিমানে জল পর্যন্ত

পান করলেন না।

ভাবগ্রাহী জনার্দন সবই বুঝলেন। ভক্তের বেদনায় তাঁর আসন টলে উঠল। তিনি ভক্ত মহাবীর হনুমানকে আদেশ করলেন, তুলসীদাস যেন এইভাবে অভুক্ত অবস্থায় পুরী ত্যাগ করে চলে না যেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে। তুলসীদাস মনের দুঃখে দ্রুত হেঁটে কাশী যাচ্ছেন। আঠারোনালা সেতু পার হওয়ার সময় হনুমান তাঁর পথরোধ করে বসে পড়লেন। প্রভুর ইশারা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তুলসীদাস তবুও যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। পথে মালতীপাতাপুর নামে এক গ্রামে 'তুলসী চৌরা' নামক স্থানে রাত্রিবাসের জন্য থামলেন এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, মা লক্ষ্মী জগন্নাথদেবকে বলছেন, ''পুরীতে এসে কোনও ভক্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করে ফিরে যায় না। ভক্ত তুলসী অন্নজল গ্রহণ না করে পুরী থেকে ফিরে যাচ্ছে। এ কেমন করে হতে দিই? তুমি কোনও ব্যবস্থা করো।" ভোরে একটি কোমল স্পর্শে তুলসীদাসের ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন একটি বালক তাঁর জন্য মহাপ্রসাদ নিয়ে এসেছে আর তাঁকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করছে। তুলসীদাস অভিমানভরে বললেন, ''জগন্নাথকে রঘুনাথবেশে যতক্ষণ না দেখব, ততক্ষণ আমি খাব না।" বালক তখন বলল, ''রামচরিতমানসখানা কোথায়? ওর ১১৭ নং দোঁহাটি পড় তো?" তুলসীদাস সঙ্গে করে এনেছিলেন তাঁর প্রাণের ধন, লাল শালুতে যত্নে মুড়ে রাখা তালপাতার পুঁথি—রামচরিতমানস। ১১৭ নং দোঁহা বের করলেন। বালক বলল, ''এবার পঞ্চম থেকে অষ্টম চৌপাই পড় দেখি, কী লেখা আছে?" তুলসীদাস পড়লেন। নিজেরই লেখা, বালকাণ্ডে স্পষ্ট লিখেছেন তিনি—''বিনু পদ চলই সুনাই বিনু কানা/ কর বিনু করম করই বিধি নানা/ অনন রহিত সকল রসভোগী/ বিনু বাণী ভকত যোগী/ তন বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা/ গ্রহই ঘ্রাণ বিনু বাসাই অশেষা/ অসি সমভাতি অলৌকিক করণ/ মহিমা যাসু যায় নাহি বরণা।"

তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, ''সত্যিই তো! আমি নিজেই যে প্রভুর লীলা বর্ণনা করেছি—তিনিই সেই পরমব্রহ্ম, যিনি চরণ বিনাই চলেন, কর্ণহীন হয়েও সব শোনেন, হস্তহীন হয়েও অগণিত কর্ম করেন, মুখটি তেমনভাবে নেই তবু সকল রস গ্রহণ করেন,... নয়ন না থাকলেও সকলই দেখতে পান, নাসিকাবিহীন হয়েও সকল ঘ্রাণ প্রাপ্ত হন... এমনই অলৌকিক পরম ব্রহ্মের লীলা!" মুখ তুলে তুলসীদাস দেখলেন বালক মিটিমিটি হাসছে। সে বলল, ''এখন মহাপ্রসাদ গ্রহণ করো আর মন্দিরে গিয়ে আরেকবার দর্শন করে এসো। তোমার বাঞ্ছিত রূপ দেখতে পাবে!" এই বলে বালক অদৃশ্য হল।

গোস্বামীজী দ্রুত প্রসাদ গ্রহণ করে ছুটে গেলেন পুরী অভিমুখে। বাইশ পাহাছা পেরিয়ে দাঁড়ালেন রত্নসিংহাসীন শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীজগন্নাথ রঘুবীর রামচন্দ্রের বেশে তুলসীকে দর্শন দিলেন। তিনি অপূর্ণ নন। তাঁর পা আছে, দুই হাতে তীর ও ধনুক সহ বহুমূল্য অলংকারে ভূষিত শ্রীরাম অনুজ লক্ষ্মণ ও বড় বোন শান্তাকে দুই পাশে নিয়ে তুলসীদাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই অপূর্ব দর্শন লাভ করে আনন্দের আতিশয্যে তুলসীদাস ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন ও জ্ঞান হারালেন। চেতনা লাভ করে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ধারে অশ্রু ঝরতে লাগল, এবং তাঁর অসীম সৌভাগ্য ও উপলব্ধির কথা শ্লোকের আকারে প্রকাশ করলেন—''যো হী রামা সো হী জগদীশা/ দীনা হীনে অনন্ত পর্বত শেষা।"

সেই দিনটি ছিল শুক্লা একাদশী, বৃহস্পতিবার। তুলসীর প্রতি জগন্নাথের অনুগ্রহ প্রকাশের দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে প্রতিবছর ওই বিশেষ দিনটিতে প্রভুকে রঘুনাথবেশে সাজানো হয়।

সাতদিন ওই বিশেষ বেশে লক্ষ লক্ষ ভক্তকে প্রভু দর্শন দান করেন। তবে স্বর্ণ ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্ন-মণিমাণিক্যখচিত মূল রঘুনাথ বেশ ছিল অত্যন্ত দামী। এটি হল রামের রাজবেশ। রাবণবধ করে অযোধ্যায় ফিরে আসার পর বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই ওই রাজকীয় পোশাক। বর্তমানে ওই পোশাক আর বিগ্রহকে পরানো হয় না। জগন্নাথের বত্রিশ রকম পোশাকের মধ্যে এই রঘুনাথ বেশ অন্যতম। মাদলাপঞ্জী অনুসারে ১৭৩৯, ১৮০৯, ১৮৩৩, ১৮৪২, ১৮৫০, ১৮৯৩, ১৮৯৬ ও ১৯০৫ সালে এই পোশাকে বিগ্রহ সজ্জিত হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের পর থেকে আর এই পোশাকটি পরানো হয়নি। এই পোশাকে সাজানোর সঙ্গে সঙ্গে রামের সভার অনুরূপ রাজসভাও তৈরি করা হত। প্রতি বছর ওইদিনে বলভদ্রকে লক্ষ্মণরূপে ও সুভদ্রাকে রামের বড় বোন শান্তারূপে সাজানো হয়। এছাড়াও রামের আরও দুইভাই ভরত ও শত্রুঘ্ন থাকেন, অন্যান্য সভাসদদের মধ্যে থাকেন বিভীষণ, নল, নীল, কুবের, জাম্বুবান, হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বায়ুদেব, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি বশিষ্ঠ, ঋষি গৌতম, ঋষভ, সুমন্ত প্রমুখ। এঁদের সকলের বসার স্থান দেওয়ার জন্য অস্থায়ীভাবে দীর্ঘ একটি সিংহাসন তৈরি করা হয়, যা রত্নসিংহাসন থেকে কালাহত দ্বার পর্যন্ত লম্বা।

সালাবেগ

লালাবেগ নামে পরিচিত জাহাঙ্গির কিলা খান ১৬০৭-১৬০৮ সালে ওড়িশার মুঘল সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি দণ্ডমুকুন্দপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বিধবার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অপহরণ করে কটকে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দেন। ধর্মান্তরিত হয়ে তাঁর নতুন নাম হয় ফতিমা বিবি। কিন্তু ফতিমার হৃদয় সিংহাসনে জগন্নাথের আসন ছিল অবিচল। এই দম্পতির এক পুত্রসন্তান হয়, তার নাম সালাবেগ। জন্মসূত্রে মুসলমান হলেও মায়ের মুখে শুনে শুনে সালাবেগ অন্তরে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছিলেন। তিনি বড় হয়ে বাবার সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। এক যুদ্ধে লালাবেগ নিহত হন এবং সালাবেগ প্রবল আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লাগলেন। তাঁর মা আকুল হয়ে জগন্নাথের শরণ নিয়ে একমাত্র ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। আশ্চর্যজনকভাবে প্রাণ ফিরে পেলেন সালাবেগ। আর তখন থেকেই অন্তরের অন্তঃস্থলে জগন্নাথের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় ও ভক্তিতে বদ্ধ হয়ে পড়লেন। সুস্থ হয়ে প্রাণের টানে তিনি পুরীতে ছুটলেন জগন্নাথ দর্শন করতে। কিন্তু পাণ্ডারা সালাবেগকে বিধর্মী বলে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না। সালাবেগ তাঁদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় গেলেন না, প্রতিবাদও জানালেন না। তিনি নিজের মনকে বললেন, ‘‘প্রতীক্ষাই ভক্তির পরীক্ষা, আর ভক্তির পরীক্ষা না দিয়ে কে কবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছে?’’ তিনি ঠিক করলেন, নিজে খাঁটি ভক্ত হয়ে ওঠার অনুশীলনে রত হবেন আর জগন্নাথ যেদিন কৃপা করে দর্শন দেবেন, সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করবেন। তিনি জানতেন, বছরে একবার, রথযাত্রার সময় প্রভু শ্রীমন্দির থেকে পথে নেমে আসেন। তখন ধনী-দরিদ্র-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই রথাসীন প্রভু জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার দর্শন লাভ করতে পারেন।

যে-পথ ধরে জগন্নাথের রথ পুরী থেকে গুণ্ডিচা অভিমুখে যাত্রা করে, সেই পথের ধারে সালাবেগ একটি কুটির নির্মাণ করে বাস করতে আরম্ভ করলেন। প্রত্যেক বছর রথারূঢ় প্রভু জগন্নাথের দর্শন করে আনন্দে ভরপুর হয়ে যেতেন তিনি। বছরের অন্য সময়ে তিনি অন্যান্য তীর্থে ঘুরে

বেড়াতেন। কোনও এক বছর সালাবেগ বৃন্দাবনে যান। রথযাত্রার আগে ফিরে আসছিলেন পুরীতে, কিন্তু পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিজের দেহের আরোগ্যের থেকেও প্রভুর দর্শন পাবেন কী না, এই আশঙ্কায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। জগন্নাথের চরণে আকুল প্রার্থনা জানালেন, ''প্রভু, আমি যে আর চলতে পারছি না! কী করে পুরী পৌঁছব? কী করেই বা তোমার দর্শন পাব? সারাবছর এই সময়টার জন্যই যে আশায় বুক বেঁধে থাকি! যাইহোক, রথের দিন তোমার দেখা যদি না পাই, অন্তত পুনর্যাত্রার সময় যেন তোমাকে দর্শন করতে পারি।'' ভক্তের ব্যাকুল আর্তি জগন্নাথের কানে পৌঁছল। সালাবেগকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে জগন্নাথ বললেন, ''চিন্তা কোরো না, আমি তোমার কুটিরের সামনে অপেক্ষা করব। তোমাকে দর্শন না দিয়ে মন্দিরে যাব না।'' আশ্বাস পেয়ে সালাবেগ কোনওমতে তাঁর রুগ্ন দেহটিকে টেনেটুনে নিয়ে চললেন। এদিকে রথযাত্রার নবম দিনে গুণ্ডিচা মন্দির থেকে রথ রওনা হল পুরীর দিকে। পথে সালাবেগের কুটিরের সামনে এসে রথের গতি স্তব্ধ হল। বহু মানুষ মিলিতভাবে অনেক চেষ্টা করেও রথকে নড়াতে পারল না। শোনা যায়, মহারাজা প্রতাপরুদ্রের নির্দেশে হাতির সাহায্যে রথ টানার চেষ্টাও করা হয়েছিল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে একটি বিশেষ স্থানে রথ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—একদিন নয়, দুদিন নয়, একটানা সাতদিন! রাজা ও মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানালেন, ''আমার পরম ভক্ত সালাবেগ আসছে। তাকে দর্শন দেব বলেই আমি অপেক্ষা করছি।''

সাতদিন ধরে পথের উপর রথে বসিয়েই জগন্নাথের আরতি, পুজো ও ভোগরাগ চলতে থাকল। অবশেষে দূর থেকে মধুর ভজন শোনা গেল। সংগীত তো নয়, যেন হৃদয় রক্তমোক্ষণ করছে—''জগবন্ধু হে গোঁসাই/ তুম্বা শ্রীচরণ বিনু অন্য গতি নাহি।''—হে জগবন্ধু প্রভু! তোমার শ্রীচরণই আমার একমাত্র ঠাঁই। একশো পঞ্চাশ ক্রোশ পথ পার হয়ে আসতে আমার বিলম্ব হল। তোমার কাছে যেন যেতে পারি, তাই আমি যতক্ষণ না আসছি, ততক্ষণ নন্দীঘোষ রথের উপরে স্থির হয়ে থাকো।

এই ভক্তকবি গর্ভমন্দিরে কোনওদিনই প্রবেশ করেননি, অথচ তাঁর গানে গর্ভগৃহের যে-বিবরণ পাওয়া যায়, তা ওড়িয়া সাহিত্যে উল্লেখিত অন্যান্য বর্ণনার চেয়ে অনেক বেশি নিখুঁত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে যা লেখা সম্ভব নয়।

সালাবেগ প্রায় একশো পঞ্চাশটিরও বেশি ভজন রচনা করেছেন। তাঁর ভজন জগন্নাথের সান্নিধ্যলাভের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এর আগে যে-সমস্ত গীত রচিত হয়েছিল, সবই সংস্কৃতে, যা ছিল সমাজের উচ্চবর্ণের ভাষা। অপ্পয় দীক্ষিত রচিত 'আর্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টকম্'-এর সঙ্গে তুলনীয় সালাবেগের সেই বিখ্যাত ভজন—'আহে নীল শৈল'। জগন্নাথকে নীল পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করে সালাবেগ যুগে যুগে তাঁর কৃপার কথা স্মরণ করাচ্ছেন—কীভাবে তিনি প্রহ্লাদকে রক্ষা করতে স্তম্ভ ভেদ করে নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন, গজেন্দ্রকে

কুমিরের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন, দ্রৌপদীকে অক্ষয়বস্ত্র দিয়ে তাঁর লজ্জানিবারণ করেছিলেন। অতএব তাঁকেও কৃপা করতে হবে। কারণ তিনি হীনজাতি হয়েও ঈশ্বরের রাতুল চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'হীনা জাতি রে মে যবনা' কথাটিতে সালাবেগ তাঁর যবন জাতি অর্থাৎ মুসলমান ধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন।

সালাবেগের ভজনের ভাষা সাধারণ মানুষের প্রাণের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিল, তাই তাঁর আবেদন অনেক বেশি সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতকে ভক্তি আন্দোলন চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। মীরা, চৈতন্য ও সুরদাসের মতোই সালাবেগের ভজনগুলিও ওড়িয়া ভক্তিসাহিত্যে অমূল্য সম্পদরূপে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে। অবশিষ্ট জীবন তিনি ওই কুঠিয়ায় অবস্থান করেছেন ও রচনা করেছেন অজস্র ভজন। তাঁর পরিচয় হয়ে উঠেছিল 'ভক্তকবি সালাবেগ'। মৃত্যুর পরে তাঁর দেহ ওই কুটিরেই সমাহিত করা হয়। সেটি এখন সালাবেগের মাজার নামে বিখ্যাত। পুরীর গ্র্যান্ড রোডের উপর 'বড়দাণ্ড'-এ সেই কুটিরের সামনে আজও সালাবেগের ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে প্রথামাফিক থামিয়ে দেওয়া হয় জগন্নাথের রথ। ভগবান তাঁর ভক্তকে দর্শন দান করেন। সালাবেগের জীবনের উপর আধারিত একটি ওড়িয়া চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল ১৯৮২ সালে।

ভগবান ও ভক্তের মাঝখানে জাগতিক কোনও নিয়মই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ভগবান বাইরের ধন সম্পদ চান না, তিনি ভক্তাধীন, ভক্তের ভক্তিমধু আস্বাদনের জন্য তিনি উন্মুখ। যদি ভক্তি ও প্রেম খাঁটি হয়, জগতের কোনও শক্তিই ভক্তকে তাঁর ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। প্রকৃত ভক্ত সর্বদা ও সর্বথা ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন, আর ঈশ্বরও তাঁর ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। আজও মুসলমান ভক্ত

সালাবেগের সমাধিপীঠ

সালাবেগের কুটিরের সামনে থেমে যাওয়া জগন্নাথের রথ প্রত্যেক বছর স্মরণ করিয়ে দেয় গীতার অমোঘ বাণী : ''অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।/ তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥''

আরম্ভ হয়েছিল একটি প্রশ্নে—''জগন্নাথ তুমি কার?'' এই ঘটনাগুলি যেন তার উত্তর—''যে আমাকে চায়, আমি তার।'' ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। Narayan Mishra, *Annals and antiquities of the temple Jagannatha*, 2005

২। *Cultural Tradition of Lord Jagannath Readings from Literary Sources : A symbol of National Integration*, IJIRT, Vol. 9, 2022, Issue 5

৩। Dr. Saroj Kumar Panda, *Jagannath Cult Through Ages*, Odisha Review, 2017

৪। Bulloram Mullick, *Lord Jagannatha in Indian Religious Life*, Calcutta, 1985